THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES

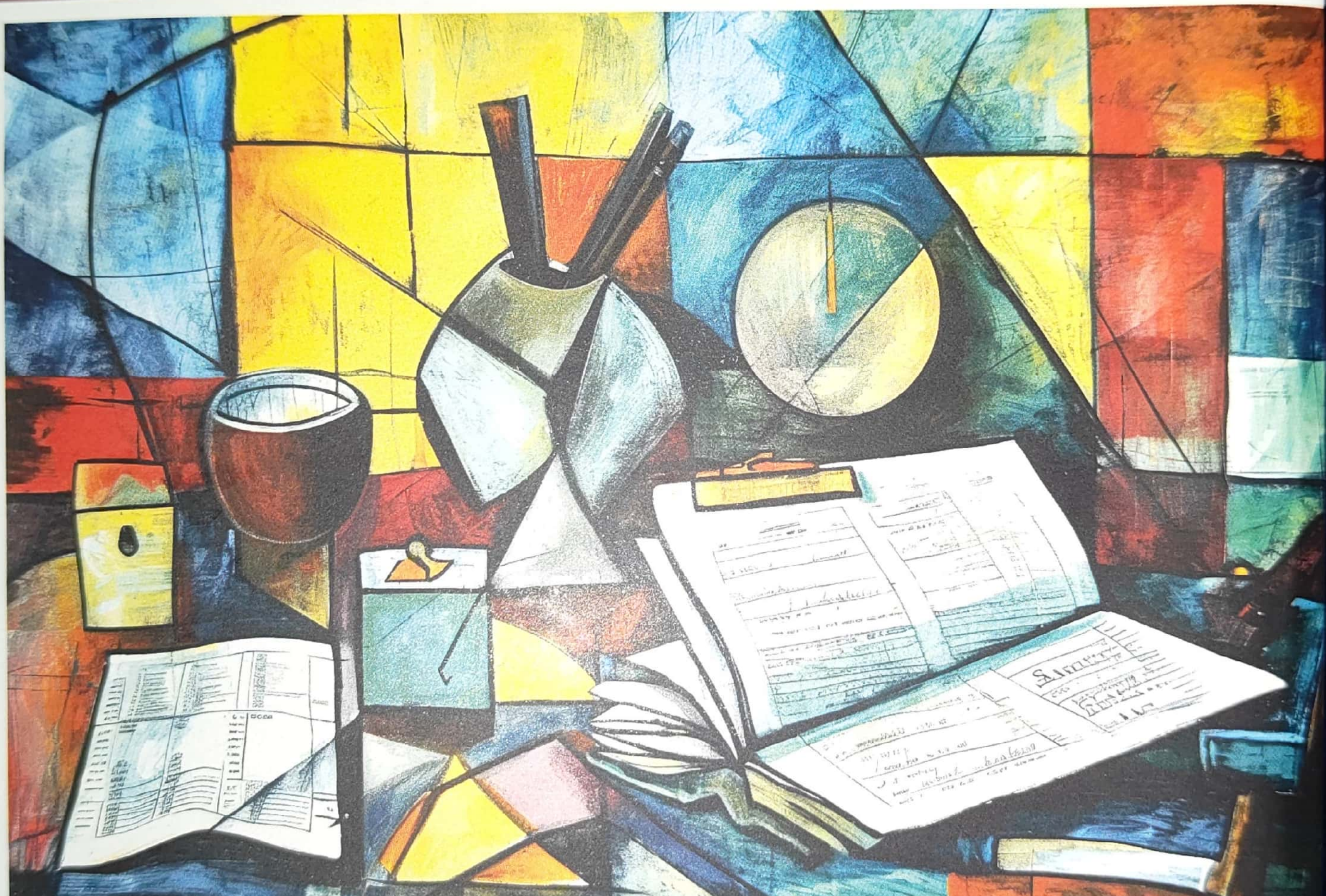

Chief Editor
Prof. (Dr.) Debasish Bhowmick

Managing Editor
Dr. Laksman Sarkar

Thoughts : Academic Writings in Languages

Chief Editor
Prof. (Dr.) Debasish Bhowmick, Principal
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati

Managing Editor
Dr. Laksman Sarkar, Librarian

Editorial Board
Dr. Rabindranath Ghosh, Deptt of Bengali (convener)
Dr. A.T.M. Sahadatulla Head, Deptt of Bengali
Mr. Avijit Mandal Head, Deptt of Sanskrit
Prof. Chandranath Adhikari, Head, Deptt of English
Dr. Kalavati Kumari, Head, Deptt of Hindi
Mr. Anindya Chakraborty, SACT, Deptt. of English
Dr. Kushal Chatterjee, SACT, Deptt. of Bengali
for
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati

Distributor
PROVA PRAKASHANI
Publisher & Book Seller
1K, Radhananth Mullick Lane
Kolkata 700 012

"THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES"
By RBC Evening College
Published by Sudarshan Prakashan, Kolkata. Rs. 400/-

ISBN : 978-93-83659-82-1

Published by
Arpita Mandal
Sudarshan Prakashan
7/1C, Radhananth Mallick Lane
Kolkata 700 012
Mobile : 9433194218

Copyright
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati
North 24 Parganas, West Bengal

First Published : February, 2023

All rights reseved. No part of this book may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from the copyright holder.

Distributor:
New Pragati Prakashani
68/69 and 1039 Bakshah Bazar
Nilkhetra, Dhaka-1205, Bangladesh
and
Jnan Bichitra
11, Jaganath Bari Raod
Agartala-799001, Tripura, India

Cover: Shekhar Mondal

Printers:
Laksminarayan Press
T/31/K, Biplabi Barin Ghosh Sarani
Kolkata-700 067

Price : Four Hundred Only.

CONTENTS

চাঁদ বণিকের পালা ঃ নির্মাণ থেকে বিনির্মাণে—ড. রবীন্দ্রনাথ ঘোষ 7

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণা ও কৃষক সমাজের ভাষা—ড. এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা 17

ঈশ্বরকথা—ড. কুশল চ্যাটার্জী 33

শ্রীমতী হে'—ড. কুশল চ্যাটার্জী 43

রবীন্দ্রমননে হিন্দমুসলিম-ভাবনা ও সম্প্রীতিবোধ—ড. কুশল চ্যাটার্জী 66

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ভিন্ন দৃষ্টিকোণের আঙ্গিনায়—অপূর্ব নন্দী 80

শ্রীউদ্ধব গীতার সাংখ্য যোগতত্ত্ব—অভিজিৎ মণ্ডল 89

"ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশে দার্শনিক সংহতি ও একত্ব ভাবনা"—অভিজিৎ মণ্ডল 98

বাণভট্টের রচনায় চিত্রিত সমাজজীবন—অভিজিৎ মণ্ডল 112

संजीव की कहानियों में नारी—डॉ. कलावती कुमारी 117

मातादीन चाँद पर कहानी में भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था—डॉ. कलावती कुमारी 128

प्रेमचंद और स्त्री : परंपरा बनाम आधुनिकता—डॉ. कलावती कुमारी 134

फैज अहमद 'फैज' और दुष्यंत कुमार की गजलों में हिंदुस्तान की छवि —डॉ. सुनीति साउ 145

People on the margins in the stories of Bibhutibhushan —Chandranath Adhikari 149

Portrayal of Human Life in the select Poems of Jayanta Mahapatra—Anindya Chakraborty 153

UNDERSTANDING RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT, 2005—Dr. Santosh Kumar Tunga 163

চাঁদ বণিকের পালা ঃ নির্মাণ থেকে বিনির্মাণে

ড. রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ, নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগণা

আধুনিক কালের বহু কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার প্রাবন্ধিকদের প্রাগাধুনিক সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ন, পুনর্গঠন, পুনর্নির্মাণ, বিনির্মাণ করতে দেখা যায়। এই ফিরে দেখা, ফিরে পড়ার ইচ্ছে গড়ে ওঠে যুগপরিবেশের কারণেই। পুরনো আখ্যানের চিরন্তনতার মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে খুঁজে বের করে তাকে সমসাময়িক করে তোলা সৃষ্টিশীলতার এক বিশেষ প্রবণতা। এইভাবে শুরু হয় ভাঙ্গা গড়ার পালা। এই ভাঙ্গা গড়ার সূত্র ধরে ফুকো তিনটি বিষয়কে তুলে ধরেন—"Free composition, decomposition and re-composition."[১] অর্থাৎ আমরা তিনটি শব্দ পেয়ে যাই নির্মাণ বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ।

'সাহিত্য বিচার ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ' গ্রন্থে সমালোচক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"আমরা সামনে তাকাই, পিছনে তাকাই; আমরা সিদ্ধান্ত নিই, সিদ্ধান্ত বদল করি, আমরা প্রত্যাশা করি, আমরা অতৃপ্তিতে কাতর হই, প্রশ্ন করি আমরা। চিন্তায় মগ্ন হই আমরা, প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার জন্য কাতর হই আমরা। এইভাবে ক্রমে গ্রহণ-বর্জনে এই নবসৃষ্টির গতিকে অব্যাহত রাখি।"[২] এইভাবে দেশ কাল সমাজ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন কালের সাহিত্য আধুনিককালে এসে পুনর্বিবেচিত ও পুনচর্চিত হয়ে চলেছে।

প্রাগাধুনিক সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্যের ছাঁচে ঢেলে পুনর্নির্মাণ একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। এভাবেই অতীতও বর্তমানের মধ্যে বেঁচে ওঠে। তবে সেইসব প্রাগাধুনিক সাহিত্যই নবরূপ লাভে উজ্জীবিত হয়, যাদের মধ্যে চিরকালীন আবেদন থাকে। অধ্যাপক সমালোচক শ্রী সনৎ কুমার নস্কর লিখেছেন—"মূল সৃষ্টির মধ্যে যদি অসংখ্য অর্থ সম্ভাবনা কিংবা চিন্তার অবকাশ থেকে থাকে তখন সেই নিহিত তাৎপর্য অব্যক্ত ব্যঞ্জনাকে লক্ষ করে নতুন কোনও নির্মাণের দিকে এগিয়ে যান উত্তর কালের স্রষ্টারা।...এভাবেই গড়ে

ওঠে পুরোনো আখ্যানের ভিন্ন পাঠ। আধুনিক জীবনবোধ দিয়ে চেনা আখ্যানকে যাচিয়ে নেওয়া বোধ হয় এই জাতীয় রচনার লক্ষ্য।"[৩]

মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্য ছিল একাধারে বিনোদন ও লোক শিক্ষার বাহন। এর মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যের ধারাটি ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। চাঁদ সদাগর চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা, আদর্শ রক্ষার জন্য পার্থিব সম্পদ ক্ষয়, ছয়টি উপযুক্ত পুত্রের অকাল মৃত্যু অকাতরে সহ্য করতে পেরেছেন। বেহুলার সতীত্ব, স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়ে তোলার জন্য তার আত্মত্যাগের তুলনা হয় না। আর আছেন সনকা। চির দুঃখিনী বাংলাদেশের মায়ের প্রতীক।

এমন আকর্ষক কাহিনি ও চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নানা রূপে বারবার ফিরে এসেছে। আধুনিক যুগের কবি সাহিত্যিকগণ পুরনো মিথের মধ্যেই সন্ধান করেছেন একালের মানুষের হৃদস্পন্দন। আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা এবং মনস্তত্ত্ব নিয়ে সমগ্র বিশ্বেই মিথকে ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে নতুন মিথ, তৈরি হয়েছে মিথের পুনর্নির্মিত গল্প-কাহিনি। মনসামঙ্গল কাব্যের পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গে মনে পড়বে মন্মথ রায়ের **'চাঁদ সওদাগর'**, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এর **'সওদাগরের নৌকা,** শম্ভু মিত্রের **'চাঁদ বণিকের পালা'**, মনোজ মিত্রের **'দেবী সর্পমস্তা'** ইত্যাদি নাটকের কথা।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যবিদ সেলিম আলদীন তাঁর **'মধ্যযুগের বাংলানাট্য'** গ্রন্থে দেখিয়েছেন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কীভাবে রক্ষিত হয়েছে বাংলার নাট্য ঐতিহ্য। মঙ্গলকাব্যের 'পাঁচালি' 'গীত' 'নাট' অংশের মধ্যে তিনি লক্ষ করেছেন দেশীয় নাট্যের কলাকৌশল। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"**বাংলা নাটকের অজস্র আঙ্গিক অজস্র বৎসরের ধারায় বাহিত হয়েছে কিন্তু আদ্যন্ত তার দেহ মনে অদ্বৈতের ঝংকার বিদ্যমান। নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেনি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ।.যেখানে কাব্য উপাখ্যানটা গেয় সেখানেই বাংলা নাটকের রূপ ও রস স্পর্শ করা গেছে।**"[৪]

শম্ভু মিত্র নাট্যকার অপেক্ষা নাট্য পরিচালক, অভিনেতা এবং নাট্য চিন্তক হিসাবেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত। তাঁর নিজের জবানীতেই জানা যায়, তিনি ছোটবেলা থেকেই নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। তিনি বলেছেন—"**কেন যে আমি অভিনয় করতে শুরু করলুম, সে বলা আমার**

পক্ষে খুব শক্ত। কিন্তু হয়েছিলো, একটা ইচ্ছে, ছোটবেলা থেকেই অভিনয় করার। কেমন করে জানিনা অভিনয় খুব ভালো লাগতো।"[৫] ছোটবেলায় শম্ভু মিত্রের মনে অভিনয় করার যে ইচ্ছে অঙ্কুরিত হয়, তার প্রকাশ ঘটতে থাকে তাঁর স্কুল জীবন থেকে।

শম্ভু মিত্র রচিত 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি নিয়ে বিশেষ আলোচনা চোখে পড়ে না, এই কারণে যে তিনি নিজে এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না। বাংলাদেশের একটি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে নাটকটি কলকাতায় 'বহুরূপী উৎসবে' অভিনীত হয়। নাটকটির নায়ক চাঁদ সওদাগর, সংক্ষেপে চাঁদ বণিক। সে শিবের পূজারী। শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদ বণিকের পালা'র কাহিনি গ্রহণ করেছেন মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্য থেকে, সেখানে যে কাহিনি আছে তা সকলের জানা।

তবুও কিছু সূত্র এখানে বলা প্রয়োজন। মনসামঙ্গলের কাহিনিতে আছে দেবাদিদেব মহাদেবের মানস কন্যা মনসা নিজেকে মর্তে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রধান মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন চম্পক নাগরির বণিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ সওদাগরকে। চাঁদ সওদাগর শিব ভক্ত। তিনি সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের উপাসক। কাজেই তাঁর পক্ষে এই অনার্য তথা অন্ধকারের দেবীকে মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল স্বাভাবিক কারণেই। ফলস্বরূপ চাঁদসদাগর ও মনসার সংঘাত চরম আকার নেয় এবং মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী অন্তিমে একটি সুন্দর উপসংহার, সমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠা।

নাট্যকার শম্ভু মিত্র 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে ব্যবহার করেছেন এক ভিন্ন কাহিনি বলয়। সেই কাহিনিতে চাঁদসদাগর অনেকটাই অদৃষ্টের হাতের ক্রীড়ানক মাত্র। দুই বিরুদ্ধ শক্তি চাঁদ বণিকের অতীত গৌরবকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য যে ঘৃণ্য পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা সমকালীন রাজনৈতিক চক্রান্ত ও দলাদলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শম্ভু মিত্র মুন্সিয়ানার সঙ্গে মধ্যযুগের গল্প কাঠামোতে সমকালীন বিষয়ের সংযুক্তিকরণ ঘটিয়েছেন।

'চাঁদ বনিকের পালা' নাটকে চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দর অস্তিত্বহীনতায় ভোগে। তাই সে উচ্চারণ করে—"আমি যে দুর্বল, আমি যে ক্ষমতাহীন আমি অপদার্থ, এইগুল্যা কার দোষ? আমার কেবল? আর, যারা জন্ম দিল, যার হাতে পালিত হলাম, সেই স্বর্গাদপি পিতা আর মাতা? সে মহান দেবদেবীদের

বুঝি কোনো অপরাদ নাই? কিংবা এই বুঝি দায়ভাগ? পূর্বপুরুষের?"[৬] —এটিও নাট্যকার শম্ভু মিত্রের নিজস্ব ভাবনা। ক্রমশ স্থিত হয়ে লখিন্দর সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য পিতাকে অনুরোধ জানায়। চাঁদ সদাগর তখন তার সর্বস্ব পণ করে লখিন্দরের সাগরপাড়ির বন্দোবস্ত করেন।

কিন্তু যাত্রার আগেই বিয়ের রাতে সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হয়। মৃত স্বামীকে কলার মান্দাসে করে গাঙ্গুড়ের স্রোতে ভেসে অসীম প্রতীক্ষায়, অবশেষে নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করে বেহুলা ফিরে পায় তার স্বামীক। কিন্তু স্বামী নিয়ে ঘর সংসার করতে গেলে মনসার চাই চাঁদের হাতের পুজো। চাঁদ বেহুলার মুখের দিকে তাকিয়ে বাম হাতে পুজো দেয়। চাঁদ মনসাকে বিহ্বল কণ্ঠে জানায় "আমার যা হয় হোক, বেহুলা লখায়ে ছেড়্যা দেরে তুই—পূজা দিচ্ছি আমি"।[৭] শিবকে জানিয়েই চাঁদ মনসাকে পূজা করেছে। মনসামঙ্গলের মতো চাঁদ বণিকের পালাতেও বেহুলা ফিরে আসে লখিন্দরকে বাঁচিয়ে নিয়ে। কিন্তু এই বেহুলা নির্যাতিতা, ধর্ষিতা। বেহুলা ও লখিন্দর আত্মহত্যা করে। সনকার মতো চাঁদও উন্মত্ত হয়ে যায়।

নাট্যকার শম্ভু মিত্র বিষয় হিসেবে চাঁদ সওদাগরের কাহিনি গ্রহণ করলেও সেই গ্রহণের মাত্রা সম্পর্কে তিনি ছিলেন গভীরভাবে সচেতন। সম্পূর্ণ কাহিনিকে না নিয়ে তার খন্ড খন্ড অংশকে বা বলা ভালো যে মূল কাঠামোটিকে গ্রহণ করে এবং মূল চরিত্রগুলিকে ঠিক রেখে সৃষ্টি করলেন এক স্বতন্ত্র কাহিনি, যাকে আমরা বলতে পারি বিনির্মাণ। চাঁদ সদাগর সমুদ্রে পাড়ি দিতে চান এবং শাসক গোষ্ঠীর রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে আপন অনুগত কিছু মানুষকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে নৌকা ভাসান। উদ্দেশ্য চম্পক নগরীর উন্নতি, আগামীর জন্য আরো বেশি সম্বল নিয়ে আসা। চাঁদের এই সাগরপাড়ির সঙ্গে চম্পক নগরীর মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন জড়িত। মনসামঙ্গলের মত শম্ভু মিত্রের পালাতেও চাঁদ সদাগর যথারীতি পরাজিত।

চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যকার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় চরিত্র কাঠামোর ওপর নবযুগের মানসিকতার আরোপ প্রশংসনীয়। নাটকের নায়ক চাঁদ সদাগর দশের স্বার্থে ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়েছেন। সত্যের নিয়ত অন্বেষণই তার জীবনের একমাত্র ব্রত। যদিও সত্য কী সে সম্বন্ধে চাঁদের নিজেরও দ্বন্দ্ব-বিমথিত চেহারা বারবার উঁকি দিয়ে গেছে।

তাই নাটকে চাঁদ সদাগরকে বলতে শোনা গেছে—"ভেবে দেখ, মাত্র দু এট্টা পথ খোলা আছে। এক, পরাজিত হয়্যা মনে তো যন্ত্রনা লাগে, পত্নী নাই, পুত্র নাই, তারপর এই অপরাধবোধ। তারা ছাড়া আর কোন বন্ধুজন ছিল না তো কখনো আমার, ভেবে দেখ, আত্মঘাতী হয়্যা এইসব সমস্যার যন্ত্রণা মিটাতে পারি. সেই এট্টা পথ আছে। না হয়তো বেনী কিংবা করালীর কথা শুন্যা মনসার পূজা দিয়্যা সমানে প্রতিষ্ঠা পেতে পারি। আরো এট্টা পথ আত্মহননের।"[৮]

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের প্রথম পর্বেই সনকাকে দেখা যায়। মঞ্চে তার প্রবেশ ঘট হাতে, মনসার ঘট নিয়ে। সেই ঘট স্থাপন করে সে বলে"সর্পরূপিণী মাতা, মাগো ভয়ংকরী।" তার সর্প বন্দনার শেষে নেপথ্য থেকে ডাক আসে চাঁদবণিকের। চাঁদের প্রবেশের পূর্বেই সনকা মনসা বন্দনা সমাপ্ত করে দ্রুত। সেই বন্দনায় সে মনসার কাছে কাতর অনুনয় জানায়—"মাগো আমার পেটের সন্তানে তুমি রক্ষা করো, আমার স্বামীরে তুমি মার্জনা কর মাগো, আমি প্রত্যহ তোমার পূজা দিব মাগো।"[৯]

সনকা যখন মনসাকে পূজা নিবেদন করে তখন তার স্বামী ও সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। কিন্তু চাঁদ সংসার নয় সমগ্র চম্পক নগরীর মুক্তি চায় চ্যাংমুড়ি কানি মনসার ত্রাস সৃষ্টির চক্রান্ত থেকে। সনকা সেই নারী যে স্বামী ও সন্তান ছাড়া আর কোন কিছুর ভাবনায় বিহ্বল হয় না। চাঁদের মনসার প্রতি অবহেলা তার সন্তান ও স্বামীর অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে, এই আশঙ্কায় সনকা সব সময় মনোবেদনায় বিহ্বল থাকে। সনকার মধ্যে বিরাজ করে চিরন্তন মাতৃ হৃদয়, তার ধারণা জন্মেছিল সর্ব দুঃখ ত্রাতা শিব নন, মঙ্গলরূপিণী মনসাই। মনসা অন্ধকার রূপিনী। অন্ধকার যাবতীয় সৃষ্টির জন্মভূমি। মাতৃগর্ভ অন্ধকার ভরা। মনসা পূজা নিয়েই স্বামীর সঙ্গে তার বিবাদ।

সনকা বাঙালি ঘরের বধূ। সনকা, সরল কিন্তু অন্ধ কুসংস্কারে আবদ্ধ। আঁধার রূপিণী মনসার পূজা করলে সাংসারিক সুখ ও কল্যাণ মিলবে, এই ছিল তার অন্ধবিশ্বাস। এই বিশ্বাসে স্থিত হয়ে সে স্বামীর সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছে। সে স্বামী সোহাগিনী রমণী হয়েও স্বামীর সঙ্গে তৈরি হয় দুস্তর ব্যবধান। যদিও মনসার পূজা করেও সনকা বাঁচাতে পারেনি তার পুত্র, সংসার এবং দাম্পত্য সম্পর্ককে। শেষ পর্যন্ত সনকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের উন্মেষ, যা এই চরিত্রকে

আরো বেশি আধুনিক করে তুলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সনকা কারো কাছেই আশ্রয় পায় না। মনসা বা স্বামী কেউই তাকে উদ্ধার করে না। দ্বিধায় দ্বন্দ্বে হতাশায় ক্লান্ত সনকা লখিন্দরের মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

বেহুলা ছিল স্থিরতার প্রতিমূর্তি, কিন্তু অভাবিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার মধ্যেও জাগল অস্থিরতা। জীবনে বেহুলা স্বামীকে পরিত্যাগ করেনি, তেমনি মরণেও তারা পরস্পরের নিকটতম সংস্পর্শ রক্ষা করেছে। সনকা ও বেহুলা দুজনেই অস্থিরতার শিকার হয়েছে। সনকা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে, আর বেহুলা বিষপানে আত্মহত্যা করে ইহলোক ত্যাগ করেছে।

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে লখিন্দর এবং অন্যান্য যুবকদের যে চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার মধ্যেও সত্তর-দশকের অশান্তহৃদয় তরুণ-তরুণীর ছবি আছে, যাদের অতীত বলে কিছু ছিল না। ভবিষ্যৎ কোন দিকে তারা জানে না। আদর্শহীনতাই যাদের জীবনের অভিশাপ। যাদের শিক্ষা আছে, বুদ্ধি আছে, সংবেদনশীল মন আছে, তাদের প্রতীক রূপে নাট্যকার ব্যবহার করেছেন লখিন্দরকে। ডক্টর পবিত্র সরকার তাঁর 'চাঁদ বণিকের পালা' নিবন্ধে বলেছেন—"নাট্যকার শম্ভু মিত্র চাঁদ সওদাগরের আখ্যানকে আজকের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে আমাদের নতুন করে আলোড়িত উন্মোচিত করেন।"

নাট্যকার শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' আধুনিক কালের এক বিশ্বস্ত দলিল। এ কথা ঠিক যে, পাঠ্য সাহিতরূপে 'চাঁদ বণিকের পালা'র এক স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে। গাম্ভীর্যময় ভাষা, চরিত্রের দীর্ঘ সংলাপ, সময়ের দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি নাটক অভিনয়ের পরিপন্থী। বিশেষ করে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' সুলভ দীর্ঘ সংলাপ—

"চাঁদ : কিন্তুক এটাও যেন ভাই বেভ্ভুল না হয়, যে, আমাদের পথে হোল দূরস্তর বাধা। সমাজে, সংসারে-দেখো, সবায়ে তো আমাদের খালি অপবাদ দিবে। আপন ঘরের লোকে, আত্মীয়-স্বজনে, আমাদের খালি গালমন্দ দিবে। কেননা, তুমি যে শিবের ভজনা করো। যেটা সত্য মনে করো সেটারে যে তুমি মন খুল্যে সত্য বলো। এইট্যাই অপরাধ। তারা বলে কালটা খারাব, -তাই, শিবেরেও মানো, তারেপর ফিরেফির চ্যাংমুড়ি কানীরেও মানো। অর্থাৎ কিনা,—জ্ঞানের ও পূজা করো,—ফির আবার, অজ্ঞানে ভজনা করো। পরামর্শ

দিয়্যা বলে, সামনে না হয় গোপনে-গোপনে করো, চুপি-চুপি করো। জানি, এইসব খুব ধানচাল বেচনের পাটোয়ারী বুদ্ধির কথা,—কিন্তুক ভাইসব, এই যে চম্পকনগরী, এরে যারা আদিকালে সৃষ্টি কর্য্যেছিল,—আমাদের সেই বাপপিতেমহদেব দল,—তারা কি কেবল পাটোয়ারী বুদ্ধি দিয়া এদেশের মর্যাদা গড়েছে? এই রত্তমত্তি হতে দূর সুপ্পারকে গেছে। আবার তত্রাৎ পাড়ি দিয়া গেছে হুই দক্ষিণ সাগরে। সেই তাম্বপন্নির তীরে গিয়্যা নোঙ্গর করেছে। রত্তমত্তির বুধগুপ্ত?- এই তো সিদিন,- হরিকেল পার হয়্যা সুবর্ণভূমিরে ছেড়্যে ওই অগ্নিকোণ ধর‍্যা , সুদূর সে কেডার বন্দরে যায়্যা উপস্থিত হোল। আর আজ? আমরা কেবলই অপরের কুৎসা করি,- খালি অপরেরে দোষ দেই, —খালি শৃগালের মতো যেন খিড়কির দুয়োরের কাছাকাছি যায়্যা ধূর্তামি করি—! ভাইরে, আমরা কি সেই নিডরিয়া বাপপিতেমহদের বংশের সন্তান? নাকি আমরা সবাই সব বেজন্মা? ক্ষেত্রজ? প্রাণ দিয়্যা তারা নিজ নিজ প্রাণটারে সওদা কর্য্যেছে—আর আমরা কী করি? (হাঁ দিয়ে বলে) এ চম্পক নগরীর যতো নিডরিয়া সদাগর ভাই,—সেইসব আত্মার তর্পণ আজ আমাদের কাজ। আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য। আমাদের জয় কেউ ঠেকাতি পারে না।"[১০]

লখিন্দর : "মাগো—আমি নিজেও জানি না কোনটা যে সত্যকথা। বাইরের পৃথিবীতে কতো নোংরা ইতরতা দেখি, সমাজটা যেন বিষ্ঠাকুণ্ড বল্যে মনে হয়, —তখন তোমার বুকে মুখ রেখ্যে মনে হয় যেন গঙ্গাস্নানে পবিত্র হলাম। এই কথা মনে হয়। সাচা কথা। কিন্তু হঠাৎ—কেন তা জানি না—এমন আক্রোশ আকণ্ঠ ফেনায়ে ওঠে—তোমারেই শত্রু মনে হয়,—মনে হয় তুমি যেন রাক্ষসীর মতো আমারে সম্পূর্ণ তছনছ কর্য্যে দিতি চাও,—না, ঠিক সে কথাও নয়—, কী যে সব মনে হয়,—যেটা ভালোবাসি সেটারেই যেন দাঁত দিয়্যা, নখ দিয়্যা ছিঁড়্যে ছিঁড়্যে ফেল্যে দিতি ইচ্ছে হয়। কেন? কোনটা আমার সত্যকার অনুভব? আমি যেন কিছু বুঝিনা মোটেই। আমি কতগুল্যা প্রতিক্রিয়া খালি। আমার অজ্ঞাতে যেন কীসব ঘটনা ঘটে আমার ভিতরে, আর আমি যেন শুধু তারি প্রতিক্রিয়াতেই কখনো-বা রাগ করি, কখনো-বা ভালোবাসি! কিন্তুক আমি কে? আমারে তো খুঁজে আমি পাইনা কখনো। তাই, মাগো, বড় কষ্ট হয়—না, কষ্ট নয়। লোকে যারে কষ্ট বলে সেটা নয়,—কিন্তুক, কী এট্টা হয় যেন—অত্যন্ত

অস্থির লাগে (আরো বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়, অস্থির ভাবে বলে) বল্যে কোনো লাভ না,—বোঝানো যাবে না।"[১১]

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের সংলাপে দার্শনিকতার প্রকাশও ঘটেছে। প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী সৌমিত্র বসু বলেছেন—"চাঁদ বণিকের পালা পড়ে তাই কোনও কোনও ইন্টেলেকচুয়াল পাঠকের যে মনে হয়েছিল অন্ধকারের এই উপলব্ধি, সমাজ জীবনের এই দার্শনিক ব্যাখ্যান শম্ভু মিত্রের ব্যক্তিগত উৎস সঞ্জাত এবং এই ব্যক্তিগত উপলব্ধির দার্শনিকতাই এই মহা নাটক পড়ার পক্ষে বাধা—তা নিতান্ত অযৌক্তিক ছিল না।"[১২]

বক্ষমান নাটকে যে নাট্য সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে তা কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়। নাট্যকারের কলমে অতি সহজে গড়ে উঠেছে এক নতুন ভাষা, যে ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর মধ্যযুগীয় বাংলা শব্দ—"দূর শালা, এট্টা নারী চাই। নারী ছাড়া অন্ধকার গাঢ় লাগেনাক।"

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের সংলাপের মধ্যে এক ধরনের প্রবহমান ছন্দ প্রকাশ পেয়েছিল। বলাবাহুল্য জীবনানন্দের কবিতার ছন্দের সঙ্গে বর্তমান নাটকের সংলাপের ছন্দে কোথাও যেন সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন—মাতালদের সংলাপ—

"আরে বেটা, কয়েক কলস মদ সাথে লয়্যা যাই,—নাইলে তো ওঝাগুল্যা যেতে দিবে নাকো—আজ রাতে উয়ারা খাবে না দাদা—চেষ্টা ছাড়া সিদ্ধিলাভ হয়?—শালা।"

নাট্য সংলাপে নাট্যকার যে বানান পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন এবং তা কি করে উচ্চারিত হবে তাও নাটকের ভূমিকা অংশে তিনি জানিয়েছেন। বলেছেন—"বইটি পড়তে গিয়ে কোনো পাঠক কিছু শব্দের বর্ণবিন্যাসে বিভ্রান্ত হতে পারেন। অভ্যাসের বশে চলিত লিপির সাহায্যে আমরা উচ্চারণটা অনুমান করে নিই। কিন্তু বিপদ হয় অচলিত ভাষার ক্ষেত্রে। তাই অসমাপিকা ক্রিয়াপদের মধ্যে যেখানে উচ্চারণ লিখিত স্বরবর্ণের ঠিক-য় নয়, আবারই-ও নয়, মাঝামাঝি যেমনকরে- কোইরে বা কোয়রে নয়, সেই সল্পস্বর বোঝাতে শব্দের অন্তে 'ŋ' (য-ফলা) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—কর্যে, বস্যে, কেট্যে, থুয়্যে বা এস্যে। তেমনি কর্যেছি, চল্যেছে প্রভৃতি।"

নাটকের বড় পরীক্ষা হয় তার মঞ্চায়নে। নাট্যকার শম্ভু মিত্র বহুরূপিতে

কয়েকবার অভিনয়ের চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছুদিন মহড়াও দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হননি। নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও দৃশ্যযোজনার দিক থেকে নাট্যকার যে যথেষ্ট পরিমাণে মঞ্চ সচেতন ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনটি পর্বে নাটকটি রচিত। পর্ব গুলোতে সেই অর্থে কোনো দৃশ্য বিভাগ নেই। আমাদের মনে হয় একটা বড় সময়কে নাটকে ব্যবহার করার ফলে দৃশ্য বিভাগ অবশ্যই জরুরি ছিল। অভিনয় করার ক্ষেত্রেও একটা বড় প্রতিবন্ধক এটা। যদিও শম্ভু মিত্র 'চাঁদ বণিকের পালা'র জন্য এক ভিন্ন ধরনের মঞ্চ কল্পনা করেছিলেন এবং সেই মঞ্চের বিবরণও খানিকটা গ্রন্থের ভূমিকা অংশে দিয়েছেন—"চাঁদ বণিকের পালা বইটি দু-একটি সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর কিছু পাঠকের মঞ্চটাকে কল্পনা করতে অসুবিধে হত। তারা নানা রকম প্রশ্ন করতেন। এইরকম কিছু প্রশ্ন শুনে মনে হলো যে, এই পালার জন্যে যে ধরনের মঞ্চ আমি কল্পনা করেছি সেটা একটু ব্যাখ্যা করা ভালো।" শম্ভু মিত্রের মঞ্চ পরিকল্পনার ব্যাখ্যা এইরকম—"মঞ্চের মধ্যে পাটাতন যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে মঞ্চের কিছু তক্তা খুলে ফেলবার সুযোগ থাকা চাই। তাহলে বেহুলা ও লখিন্দরের সাঁতালি পর্বতের সানুদেশে উঠে আসাটা, এবং পরে ওঝা ও প্রদীপ নিয়ে পুরনারীদের কাঁদতে কাঁদতে এসে বাসর ঘরের দিকে যাওয়াটা দেখতে ভালো লাগবে। সত্য লাগবে।

এবং ঐ যে তক্তা তুলে ফেলে খানিকটা ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছে, সেইখান দিয়েই প্রচুর আলোতে উজ্জ্বল। বেহুলা লগি ঠেলে বেয়ে নিয়ে যায় তার ভেলাটা। তখন মঞ্চের সুমুখের দিকে অন্ধকার। প্রদীপ হাতে ছায়ার মতো মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে গানটা গাইছে আর মঞ্চের একদম পেছনে আকাশী পটের সামনে দিয়ে, বেহুলা লগি ঠেলে চলেছে। পাটাতনের তল থেকে একটু নিচু দিয়ে।"

রঙ্গমঞ্চের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন শম্ভু মিত্র। তাঁর দীর্ঘদিনের সহযোগী বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব কুমার রায় যথার্থই বলেছন, "শম্ভু মিত্র আজ কিংবদন্তি।" নাটকটি কাহিনী নির্মাণ, সংলাপ সংযোজনা, চরিত্র চিত্রন এবং মঞ্চ পরিকল্পনা সব দিক দিয়ে অভিনবত্বের পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। পাঠ্য সাহিত্য হিসাবে 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটির এক স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনিকে অবলম্বন করে শম্ভু মিত্র 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে যে

বিনির্মাণ ঘটালেন, যা সমসাময়িক এমনকি পরবর্তী কালেও বহু নাট্যকারকে এ জাতীয় শিল্পকর্ম রূপায়নে আনুপ্রাণিত করেছিল।

তথ্যসূত্র

১. Michel Faucault : The archaeology of knowledge, London, 1969, P. 69

২. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬ পৃষ্ঠা-১৩৯

৩. সনৎকুমার নস্কর, প্রগধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, দিয়া পাবলিকেশন, ২০১২, পৃষ্ঠা-২০১

৪. সেলিম আলদিন, মধ্যযুগের বাংলা নাট্য পৃষ্ঠা-৩

৫. শম্ভু মিত্রের সঙ্গে কিছুক্ষণ, সুবীর রায়চৌধুরী যুগান্তর, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

৬. শম্ভু মিত্র চাঁদ বণিকের পালা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৮

৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬২

৮. তদেব

৯. তদেব

১০. তদেব, পৃষ্ঠা-২৪

১১. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৬

১২. সৌমিত্র বসু, নাট্য শিক্ষক শম্ভু মিত্র, নাট্য একাডমী পত্রিকা, সংখ্যা-৬